بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২২শে জুলাই, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কায়িক শ্রম এবং কষ্টসাধ্য কাজের অভ্যাস, স্বাস্থ্য রক্ষা এবং দেহকে সুস্থ-সবল রাখার জন্য তাঁর রীতি কি ছিল এর উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, তিনি মোটেই অলস ছিলেন না বরং অত্যন্ত পরিশ্রমী একমানুষ ছিলেন, আর নির্জনতাপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও কায়িক শ্রম করতে তিনি কখনও দ্বিধাবোধ করতেন না। অনেক সময় এমন হয়েছে যে, সফরে যেতে হলে সফরের নিমিত্তে নির্ধারিত ঘোড়া চাকরের সাথে আগেই পাঠিয়ে দিতেন আর পায়ে হেঁটে প্রায় বিশ/পঁচিশ মাইল দুরত্ব অতিক্রম করে নির্ধারিত গন্তব্যে পৌঁছতেন, বরং প্রায়শঃ তিনি পায়ে হেঁটেই সফর করতেন, বাহনে কমই বসতেন। পায়ে হাঁটার এই অভ্যাস তাঁর জীবনের শেষ অংশেও ছিল। ৭০ বছর অতিক্রান্ত বয়সেও, যখন তিনি বেশ কিছু রোগে আক্রান্ত ছিলেন, প্রায় সময় দৈনন্দিন বায়ু সেবনের জন্য যখন বাহিরে যেতেন তখন প্রতিদিন চার/পাঁচ মাইল পর্যন্ত ঘুরে আসতেন, এমনকি অনেক সময় সাত মাইলও পায়ে হাঁটতেন। আর প্রৌঢ়ত্বের পূর্বের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন যে, অনেক সময় ফজরের নামাযের পূর্বেই ভ্রমণের জন্য বেরিয়ে যেতেন, আর বাটালা পর্যন্ত পৌঁছানোর পর যা কিনা একই সড়ক পথে কাদিয়ান থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত একটি গ্রাম, সেখানে পৌঁছানোর পর ফজরের নামাযের সময় হতো।

অতএব এই হলো আমাদের জন্য ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত, বিশেষ করে ওয়াকেফে যিন্দেগীদের জন্য যাদের ওপর জামাতের সেবার দায়িত্ব রয়েছে, যাদের মাঝে প্রথম সারিতে আসবেন মুবাল্লিগ-মুরুব্বীরা। আপনারা স্বাস্থ্যের সুরক্ষা এবং কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য ব্যায়াম বা রীতিমত ভ্রমণের অভ্যাস করুন। সময়ের স্বল্পতার কারণে বা অন্য যে কোন কারণে যদি ভ্রমণ করতে না পারেন তাহলে কিছুটা হলেও ব্যয়ামের জন্য সময় বের করা উচিত। কোন কোন মুরুব্বী যারা এখনও যৌবনকাল অতিক্রম করছেন তাদের দেহ দেখে বোঝা যায় যে, তারা ব্যায়াম করে না। জিজ্ঞেস করা হলে তারা বলে যে, ব্যয়াম করতাম, কিছুকাল থেকে ব্যায়াম ছেড়ে দিয়েছি। আমাদের মুবাল্লিগ বা মুরুব্বীদের ওপর যতবড় দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে তার কারণে দেহ সুঠাম এবং সুস্বাস্থ্যবান রাখার জন্য তাদের ব্যায়ামের প্রতি রীতিমত দৃষ্টি দিতে হবে। আমাদের বহির্বিশ্বের জামেয়ার মুরুব্বী/মুবাল্লিগরা পড়ালেখা শেষ করে প্রশিক্ষণের জন্য রাবওয়ায়ও গিয়ে থাকেন, আর সেখানে তাদের মেডিক্যাল চেকআপও হয়ে থাকে। ডাক্তার নূরী সাহেব যিনি সেখানে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, তিনি লিখেছেন যে, মাশাআল্লাহ্ সকল অর্থে এরা অনেক ভালো মুরুব্বী কিন্তু তাদের অনেকেই এমন ছিলেন যাদের ওজন বিপদজ্জনক সীমা পর্যন্ত বেশি। তাই এদিকে তাদের মনোযোগ দেয়া উচিত। কর্মক্ষেত্রে গিয়ে তো মানুষ এই দৃষ্টিকোণ থেকে আরো বেশি অমনোযোগের শিকার হয়ে যায়।

প্রধানত আমাদের মুরুব্বীদের এবং ওয়াকেফে যিন্দেগীদের কোন না কোন প্রকার ব্যায়াম অবশ্যই করা উচিত। দ্বিতীয়ত পাশ্চাত্যে অস্বাস্থ্যকর খাবারের ছড়াছড়ি। তারা নিজেরা এটিকে জাঙ্ক ফুড নাম দিয়ে থাকে। এই খাবার এড়িয়ে চলা উচিত। সুতরাং আশা করি আপনারা এই বিষয়েও যত্নবান হবেন। যদি একা থাকেন তাহলেও এতটা সময় তো পাওয়া যায়ই যে, যেখানে মিশন হাউস

রয়েছে, পরিবার সাথে না থাকলেও কিছুটা খাবার রান্না করার জ্ঞান একজন মুরুব্বীর অবশ্যই থাকা উচিত। যাহোক এদিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। আমি শুধু আপনাদেরই উপদেশ দিচ্ছি না বরং আমি নিজেও আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সাইকেল এক্সারসাইজ মেশিন এবং অন্যান্য মেশিনে ব্যায়াম করে থাকি। এখন পর্যন্ত তো আল্লাহ্ তা'লা এর তৌফিক দিচ্ছেন। যাহোক আমাদের সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ওয়াকেফে যিন্দেগী এবং মুরুব্বী চাই। তাই এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের এই কথার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত যে, তারা যেন নিজেদের স্বাস্থ্যের বিষয়ে উদাসীন না হয়, যেন নিজেদের দায়িত্ব তারা সুচারুরূপে পালন করতে পারে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রেক্ষাপটে আরো একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। আজকাল লাউডস্পিকার ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা আমাদের আওয়াজ সর্বত্র পৌঁছিয়ে থাকি, আর এ কারণে আমাদের অনেকেই উচ্চ স্বরে কথা বলার অভ্যাস রাখে না বা পারলেও সামান্য। বিশেষ করে মুরুব্বী/মুবাল্লিগ যারা বক্তৃতা করে আর যখন কর্মক্ষেত্রে যায় বা তবলীগ করতে হয় তাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, তাদের উচ্চ স্বরে কথা বলার অভ্যাস করা উচিত। অনেক সময় মাইক থাকে না, বিশেষ করে দরিদ্র বিশ্বে এমনটি হয়। অতীতে আওয়াজ পৌঁছানোর কোন মাধ্যম ছিল না। গণ জমায়েতে শেষ পর্যন্ত আওয়াজ পৌঁছানোর জন্য অনেক চেষ্টা করতে হতো বা কঠিন ছিল। মানুষ উচ্চ স্বরে কথা বলার অভ্যাসও রপ্ত করতো। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সাধারণত খুব ক্ষীন কণ্ঠে মানুষের উদ্দেশ্যে কথা বলতেন। কিন্তু প্রয়োজনে পৃথিবীকে ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করতে হলে তখন তার অবস্থা কেমন হতো তার চিত্র হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এভাবে অঙ্কন করেছেন। তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন লাহোরে বক্তৃতার জন্য দন্ডায়মান হন তখন লাহোরের সবচেয়ে বৃহৎ হলে তাঁর বক্তৃতা হওয়ার কথা ছিল। সেখানে জনসমুদ্র ছিল আর মানুষের এত ভিড় ছিল যে, দরজা খুলে দেয়া হয় বরং বাহিরে তাবু লাগানো হয়, কিন্তু তবুও শ্রোতা কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। বক্তৃতার প্রথম দিকে রীতি অনুযায়ী তাঁর আওয়াজ কিছুটা ক্ষীণ ছিল, কোন কোন মানুষ তখন হৈচৈও করে, কিন্তু পরে যখন তিনি কথা বলছিলেন তখন এমন মনে হচ্ছিল যেন আকাশ থেকে সিঙ্গা বাজানো হচ্ছে। আর মানুষ হতভম্ব ও নির্বাক হয়ে বসেছিল। তাই ধর্মের খিদমতের জন্য আওয়াজ উঁচুও করতে হয়। যাদের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে এই দৃষ্টিকোণ থেকেও তাদের এইদিকে মনোযোগ দেয়া উচিত।

অনেক সময় কিছু মানুষ উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও দুঃশ্চিন্তা ব্যক্ত করে যে, আমাদের পুণ্যের অবস্থা সবসময় এক রকম থাকে না। তাদের জন্য এটি বড়ই চিন্তার কারণ হয়ে উঠে। এটি এ দৃষ্টিকোণ থেকে ভালো কথা যে, মানুষ আত্মবিশ্লেষণ করে। এভাবে আত্মবিশ্লেষণ করা একটি ভালো কথা যে, আমার মাঝে পুণ্যের ঘাটতির যে অবস্থা রয়েছে বা পুণ্যকর্ম ও ইবাদতে পূর্বে যেই আগ্রহ ছিল সেই ক্ষেত্রে ঘাটতি হলে আত্মজিজ্ঞাসা করা যে, এমনটি কেন হলো আর এই চিন্তা থাকা যে, এই অবস্থা যেন দীর্ঘস্থায়ী না হয় আর তার চিকিৎসার কথা চিন্তা করা উচিত। এমনটি করা আসলে ভালো কথা। এটি ভালো মনোভাব। কিন্তু অনেক সময় এটিও হয় যে, নেকীর ক্ষেত্রে হ্রাস-বৃদ্ধির ঘটনা ক্রমাগতভাবে ঘটতে থাকে। একবার মহানবী (সা.)-এর কাছে একজন সাহাবী আসেন। তিনি বলেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি মুনাফিক হয়ে গেছি। আপনার অধিবেশনে বা বৈঠকে যখন বসি তখন আমার অবস্থা ভিন্ন হয় আর আপনার বৈঠক থেকে যখন চলে যাই বা প্রস্থান করি তখন আমার অবস্থা

ভিন্ন হয়। অর্থাৎ আপনার সাহচর্যে আমার পুণ্য এবং হৃদয়ের পবিত্রতা যা হয় তা পরে আর থাকে না। মহানবী (সা.) বলেন, এটিই তো মু'মিন হওয়ার লক্ষণ, তুমি মুনাফিক নও। রসূলে করীম (সা.)-এর সাহচর্যের যে পবিত্র প্রভাব ছিল, এটি জানা কথা যে, তাঁর (সা.) পবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তি এবং সাহচর্যের সেই প্রভাব তো পড়ারই ছিল এবংপ্রভাব বিস্তার করেছেও কেননা তাঁর কাছে যারা বসতো তারা পবিত্র হৃদয় নিয়েই বসতো এবং শিখার জন্য বসতো আর খোদার সাথে সম্পর্কের মান উন্নয়নের জন্য বসতো। এরপর বাহিরে গিয়ে এতে কিছুটা ঘাটতিও সৃষ্টি হতো। যাহোক সেই সাহাবীর হৃদয়ে খোদাভীতি, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা ছিল। তাই তার চিন্তা হয় যে, পুণ্যে ঘাটতির এই অবস্থা কোথাও দীর্ঘ না হয়ে যায়, আর কোথাও তা আমাকে ধর্ম থেকে দূরে না ঠেলে দেয়, কোথাও কপটতা বা মুনাফিকাত না আমার মাঝে দানা বাধে। তো এই ছিল সাহাবীদের চিন্তা। এই সচেতনতা যদি সৃষ্টি হয় তাহলে মানুষ দোয়া এবং ইস্তেগফারের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থার উন্নয়নের প্রতি মনোযোগ দিবে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে এক জায়গায় বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন যে, কোন কোন শিশুর স্বাস্থ্য সচরাচর মায়েদের সন্দেহের কারণে ভালো থাকে। বাচ্চার সামান্য কষ্ট হলেই মা সেটিকে চরম কষ্ট জ্ঞান করে আর চিন্তা করে যে, আল্লাহ্ই জানে কি হয়েছে। আর পুরো সচেতনতার সাথে তার চিকিৎসা করায়। আর রোগের ক্রনিক আকার ধারণ করা থেকে বাচ্চা রেহাই পায়। কিন্তু কোন কোন মা এমন হয়ে থাকে যে, বাচ্চা যে অসুস্থ্য এই ধারণাই তাদের এত দেরীতে হয় যখন রোগ ক্রনিক রূপ ধারণ করে আর চিকিৎসা করা কঠিন হয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন, তো মায়ের সন্দেহও বাচ্চার স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে নিজের বিষয়ে এমন সন্দেহ যে, পুণ্য করার ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে না তো বা আমি খোদা তা'লা থেকে দূরে সরে যাচ্ছি না তো, এমন সন্দেহ উপকারীই হয়ে থাকে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, এভাবে মানুষ বিপদের মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় আর নিজেকে সেই আক্রমণ থেকে নিরাপদ অবস্থানে নিয়ে যায়।

তো প্রকৃত অর্থে তারাই পুণ্যের ক্ষেত্রে অগ্রগামি আর খোদার নির্দেশের অধীনস্ত হয়ে থাকে যারা মায়ের মতো সবসময় সচেতন থাকে যে, তাদের নামাযে বা দোয়ায় ঘাটতি তাদের কোন দুর্বলতা এবং পাপের ফলাফল নয় তো। আর এর ফলে কোথাও তারা এমন আধ্যাত্মিক রোগী না হয়ে যায় যার রোগ হবে দুরারোগ্য এবং যে রোগ অনেকটা ছড়িয়ে পড়বে। তো মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা তো এমন সৌভাগ্যবান মানুষ ছিলেন যারা নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করলে যখন তাদের দুশ্চিন্তা হতো তখন তারা তাঁর (সা.) সহচর্যে গিয়ে ঠাই নিতেন। আর রসূলে করীম (সা.)-এর পবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তির মাধ্যমে নিজেদের চিকিৎসা করাতেন। কিন্তু আমাদেরও এই চিন্তায় মগ্ন হয়ে নিজেদের ইবাদত, দোয়া এবং ইস্তেগফারের বিভিন্ন মাধ্যমগুলোকে স্থায়ীভাবে অবলম্বন করে থাকা উচিত আর এভাবে সবসময় চিকিৎসা করে যাওয়া উচিত। আমাদেরও যদি সন্দেহ হয় তাহলে সেই সন্দেহ ভ্রুক্ষেপহীনতার চেয়ে উত্তম কেননা অনেক সময় ভ্রুক্ষেপহীনতা মানুষকে খোদা তা'লা থেকে দূরে ঠেলে দেয়। আর এর ফলশ্রুতিতে আমরা ধীরে ধীরে ধর্ম থেকেও দূরে চলে যাই এবং দুরারোগ্য আধ্যাত্মিক রোগে আক্রান্ত হয়ে যাই। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে সুগভীর মনোযোগ নিবদ্ধ করার প্রয়োজন রয়েছে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একবার এই বিষয়টির ওপর আলোকপাত করছিলেন যে, সুখ বা আনন্দ ও বেদনা অনুভূতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন কোন ঘরে যদি বিয়ের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে তাহলে সেই বিয়ের আনন্দ উল্লাসের জন্য ঋন করতে হলেও মানুষ ঋন করে আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করে। আর তার আত্মীয় স্বজনরাও সেই আনন্দের অংশ হয়ে যায়। কিন্তু যাদের সেই আনন্দের সাথে কোন সম্পর্ক থাকে না তাদের জন্য সেই ব্যক্তির আনন্দিত হওয়া বা সেই পরিবারের মানুষের আনন্দিত হওয়া বা নিকট আত্মীয়ের আনন্দ উল্লাস করা আর এর জন্য কষ্ট করা বা ঋন নেয়া কোন অর্থই রাখে না। তাদের এর সাথে কিইবা সম্পর্ক যে, কে আনন্দ উল্লাস করলো বা করলো না অথবা ঋন নিয়ে আনন্দ উল্লাস করলো কি করলো না। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি তার বংশের ভরণপোষণকারী হয়ে থাকে আর সে যদি মারা যায় তাহলে তার ঘরে এক প্রকার শোক ছেয়ে যায় বা ঘরের মানুষ শোকে জর্জরিত থাকে। কিন্তু যাদের তার সাথে কোন সম্পর্ক নেই তাদের জন্য তার মৃত্যু হওয়া কোন অর্থ রাখে না। সহস্র সহস্র মানুষ প্রতিদিন মারা যায়, অনেক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে এবং মৃত্যুর সংবাদ আসে কিন্তু যাদেরকে আমরা জানি না তাদের মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া সত্ত্বেও সেই মৃত্যুকে মানুষ অনুভব করে না। কিন্তু কারো কোন নিকটাত্মীয়ের যদি ইন্তেকাল হয় তাহলে মানুষ তা গভীরভাবে অনুভব করে। আবার কিছু মানুষ এমনও হয়ে থাকে যারা অন্যদের জন্য গভীর কষ্টের কারণ হয়ে থাকে, নিষ্ঠুর ডাকাত বা সন্ত্রাসী হয়ে থাকে। এদের মৃত্যুতে এক শ্রেণীর মানুষের বেদনার পরিবর্তে আনন্দই হয়ে থাকে। কিন্তু তাদের নিকটাত্মীয়েরা দুঃখভারাক্রান্তও হয়ে থাকে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এটি আবেগ এবং অনুভূতির এক অদ্ভুত জগৎ, এটি নিয়ে ভাবলে অদ্ভুত মানসিক অবস্থা বিরাজ করে। একটি কথা এক জনের জন্য আনন্দের মুহূর্ত এবং প্রশান্তির ক্ষণ হয়ে থাকে আর অন্যের জন্য তা হয়ে থাকে শোক এবং দুঃখের কারণ। অনেকে এমনও হয়ে থাকে যাদের সুখের সাথেও সম্পর্ক থাকে না আর দুঃখের সাথেও নয়। তিনি বলেন, এই বিষয়টি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাকে একটি মাত্র বাক্যের মাধ্যমে বুঝিয়েছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) রীতিমত পত্রিকা পড়তেন। এর মাঝে, আমাদের সেসব লোকদের জন্য যাদের ওপর ধর্মীয় দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে, শিক্ষনীয় দিক হলো তাদের রীতিমতো পত্রিকা পড়া উচিত আর ছোট ছোট সংবাদও দেখা উচিত। যাহোক তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) রীতিমত পত্রিকা পড়তেন। ১৯০৭ সনের কথা, একদিন পত্রিকা পড়তে পড়তে তিনি হঠাৎ আমাকে মাহমুদ বলে ডাক দেন। এই আওয়াজ এমন ছিল যেভাবে তাৎক্ষনিক কোন কাজ করার জন্য কেউ কাউকে ডাকে অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-কে ডাকেন আর তাঁর আওয়াজ এমন ছিল যেন তাৎক্ষনিকভাবে করার মতো কোন কাজের জন্য ডাকছেন। তিনি বলেন, আমার উপস্থিত হওয়ার পর তিনি আমাকে একটি সংবাদ শুনান, এক ব্যক্তির কথা বলেন যার নাম এখন আমার মনে নেই। তিনি (আ.) বলেন যে, সে মারা গেছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এটি শুনে আমার হাসি চলে আসে। আমি বললাম যে, এতে আমার কি। হুযূর (আ.) বলেন, তার ঘরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে আর তুমি বলছো আমার কি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, এর কারণ কি? এর কারণ হলো যার সাথে সম্পর্ক থাকে না তার দুঃখেরও কোন প্রভাব মানুষের ওপর পড়ে না। অনুরূপভাবে যদি আনন্দের কোন বিষয় হয়ে থাকে তারও কোন প্রভাব পড়ে না। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই কথা তখন বর্ণনা করেন যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর পুত্র

মিঞাঁ আব্দুস সালাম সাহেবের নিকাহ্ হয়েছিল। নিকাহ্র সময় তিনি এই কথা বলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) নিজের আবেগ এবং অনুভূতি এভাবে প্রকাশ করেন যে, আজকে যদি খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) জীবিত থাকতেন তাহলে তিনি কতইনা আনন্দিত হতেন আর দোয়া করতেন। আর এর কল্যাণে অন্যদেরও দোয়ার প্রতি কতইনা প্রেরণা সৃষ্টি হতো। তিনি বলেন যে, এই উপলক্ষ্য এবং এই চিন্তা আমাদের হৃদয়ে এক বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি করে। যদি কোন প্রিয়জনের কোন আনন্দঘন মুহূর্ত হয়ে থাকে তাহলে তা আমাদের হৃদয়ে এক বিশেষ ভাবাবেগ সৃষ্টি করে যে, কিভাবে আমাদের সেই প্রিয়জন এত ঘনিষ্টজনের জন্য দোয়া করতেন আর আমাদের সারা দেহে আনন্দের এক তরঙ্গ ছুটে যায়।

সুতরাং এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, আমাদের প্রতি অনুগ্রহকারীদের জন্য এবং তাদের সন্তান-সন্ততির জন্য বিশেষভাবে দোয়া করা উচিত। আনন্দ এবং দুঃখের মুহূর্তে তাদের স্মরণ বা অনুভব করা উচিত আর মোটের ওপর জামাতের সদস্যদের জন্যও আমাদের সুখ-দুঃখের বহিঃপ্রকাশ ঘটা উচিত কেননা জামাত একই সত্তার নাম, আর এটি আমরা তখনই অনুভব করবো যদি জামাতের প্রতিটি সদস্যের দুঃখ এবং বেদনাকে আমরাও অনুভব করি। এটিই এই জামাতকে ঐক্য বা একতার সূত্রে গেঁথে দেয়ার কারণ হবে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর আনুগত্যের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) সম্পর্কে আমার মনে পড়ে যে, পটিয়ালা নিবাসী আব্দুল হাকীম মুর্তাদ যখন আহমদী ছিল তখন তিনি তাকে অনেক ভালোবাসতেন, আর তারও উনার সাথে সুগভীর সম্পর্ক ছিল। সে যখন মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরোধিতা আরম্ভ করে তখনও সে এটিই লিখেছে যে, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতে মৌলভী নূরুদ্দীন ছাড়া আর কেউ নেই যে সাহাবীদের আদর্শ হতে পারে, এই ব্যক্তি নিঃসন্দেহে জামাতে আহমদীয়ার জন্য গর্বের কারণ। মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, পটিয়ালা নিবাসী আব্দুল হাকীম একটি তফসীরও লিখেছিল যাতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-কে জিজ্ঞেস করে অনেক কিছু সে লিপিবদ্ধ করেছে। আব্দুল হাকীম যখন মুর্তাদ হওয়ার ঘোষণা দেয় তখন আমি দেখেছি যে, খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) ব্যতিব্যস্ত হয়ে তাৎক্ষনিকভাবে তার শিষ্যদের ডেকে পাঠান এবং বলেন যে, যাও যত দ্রুত সম্ভব আমার পাঠাগার থেকে আব্দুল হাকীমের তফসীরটা বের করে দাও। সে যে তফসীর লিখেছিল তা উনার পাঠাগারে পড়েছিল। তিনি বলেন, তাৎক্ষণিকভাবে সেখান থেকে তা বের করে দাও, কোথাও এমন না হয় যে, এটির কারণে খোদার ক্রোধানল আমার ওপর বর্ষিত হয়। মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, অথচ তা কুরআনেরই তাফসীর ছিল আর এর বহু আয়াতের তফসীর সেই ব্যক্তি স্বয়ং তাঁর কাছে অর্থাৎ খলীফা আউয়াল (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেই লিখেছিল। কিন্তু তার ওপর যেহেতু খোদার ক্রোধ বর্ষিত হয়েছে এবং সে মুরতাদ হয়ে গেছে তাই তার লিখিত তাফসীরও তিনি তাঁর পাঠাগার থেকে বের করে দেন এবং নিজস্ব রুচী অনুসারে তিনি এটি ভেবেছেন যে, এই বই অন্যান্য বই-এর সাথে একত্রে থেকে সেগুলোর জন্যও নোংরামীর কারণ হবে। তো এই ছিল ধর্মীয় আত্মাভিমান যা নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য অনুকরণীয়।

কিছু মানুষ আপত্তি করে যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ জামাতীভাবে কাউকে যদি শাস্তি দেয়া হয় বা কারো বিরুদ্ধে যদি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয় তাহলে সে নিজের সম্পর্কে বলে যে, আমার বিরুদ্ধে যে

ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তা অন্যায়, অমুক ব্যক্তির বিরুদ্ধে তা নেওয়া হয়নি এবং তাকে সমর্থন বা তার সাহায্য করা হয়েছে। এমন আপত্তি করা নতুন কিছু নয়। সকল যুগে এমন আপত্তি করা হয়, আজও মানুষ এমন করে আর পূর্বেও করত। এমন লোকদের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে,

প্রকৃত পক্ষে ব্যবস্থাপনার সংশোধনের জন্য চিন্তা-ধারার ঐকতানের একটা গন্ডি থেকে থাকে। একটি মতভেদ বড় হতে পারে কিন্তু তা যদি নৈরাজ্যের কারণ না হয় তাহলে সেই মতভেদ যে পোষণ করে তাকে কোন কোন সময় জামাতভুক্ত থাকার অনুমতি দেয়া যেতে পারে বা তার জন্য অনুমতি থাকতে পারে, কিন্তু অপর দিকে কোন ব্যক্তির মতভেদ ছোট হলেও তা যদি ফিতনার কারণ হয় তাহলে তাকে জামাত থেকে বহিষ্কার করা যেতে পারে। তিনি বলেন, একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে বলে যে, আমি মাত্র শিয়া ধর্ম বা শিয়া মতবাদ থেকে বেরিয়ে আহমদীয়াতে যোগ দিয়েছি আর হযরত আলী (রা.)-কে হযরত আবুবকর এবং হযরত উমর (রা.) থেকে বড় এবং শ্রেষ্ঠ মনে করি কেননা আমার ওপর শিয়া মতের প্রভাব বেশি। এই বিশ্বাসের বর্তমানে বা এই বিশ্বাস থাকা অবস্থায় আমি আপনার হাতে বয়আত করতে পারি কি না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে লিখেছেন যে, হ্যাঁ, আপনি বয়আত করতে পারেন। কিন্তু পক্ষান্তরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার কয়েক ব্যক্তিকে শাস্তি স্বরূপ কাদিয়ান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন আর তাদের সম্পর্কে বিজ্ঞাপনও প্রচার করেন, কারণ শুধু এটিই ছিল যে, তারা পাঁচ বেলার নামাযে উপস্থিত হতো না, আর কতক এমন ছিল যাদের বৈঠকে হুক্কা পান এবং আজে বাজে কথা বার্তার রীতি ছিল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এখন আমাকে বল যে, হযরত আলীকে হযরত আবু বকরের চেয়ে শ্রেয় মনে করা আর হুক্কা পান করার মাঝে কোন্‌টি বেশি জঘন্য? নিঃসন্দেহে প্রত্যেক ব্যক্তি এই কথাই বলবে যে, হযরত আলীকে হযরত আবুবকরের চেয়ে বড় মনে করা বেশি জঘণ্য বা বড় কথা আর হুক্কা পান করা সামন্য বিষয়, কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একটা বড় মতভেদ পোষণ করা সত্ত্বেও এক ব্যক্তিকে তাঁর হাতে বয়আতের অনুমতি দেন আর হুক্কা পান এবং হাসি তিরস্কারে মগ্ন থাকার দোষে অন্যজনকে কাদিয়ান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন, অথচ স্বয়ং মসীহ্ মওউদ (আ.) এক নিমন্ত্রণের সময় নিজে এর ব্যবস্থা করেন। তুর্কী দূত হুসেন কামী যখন কাদিয়ান আসে এবং তার ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়, মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, আমি তখন ছোট ছিলাম কিন্তু আমার ভালভাবে স্মরণ আছে যে, এক বৈঠকে মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব মরহুম বর্ণনা করেন যে, এরা সিগারেট পানে অভ্যস্ত হয়ে থাকে, যদি এর ব্যবস্থা না করি তাহলে তাদের কষ্ট হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, কোন অসুবিধা নেই, কেননা এটি মদ ইত্যাদির মত নিষিদ্ধ বা হারাম বিষয় নয়। সুতরাং মদের মতো অবৈধতা যে সমস্ত জিনিসের নেই এমন জিনিস ব্যবহারের কারণে এক ব্যক্তিকে তিনি জামাত থেকে বহিস্কার করেন, কিন্তু যে ব্যক্তি বলেছিল আমি হযরত আবুবকর (রা.)-এর চেয়ে হযরত আলীকে শ্রেষ্ঠ মনে করি, যদিও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিজের বিশ্বাস ছিল যে, হযরত আবুবকর (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর চেয়ে শ্রেয় বা শ্রেষ্ঠ কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাকে বয়আতের অনুমতি দেন। তিনি বলেন, সত্যিকার অর্থে কিছু বিষয় সাময়িক ফিতনা এবং অশান্তির দিক থেকে বড় বা জঘন্য হয়ে

থাকে কিন্তু তা হয়ে থাকে তুচ্ছ বিষয়। আর কোন কোন কথা সাময়িক নৈরাজ্যের দিক থেকে সামান্য হয়ে থাকে অথচ প্রকৃত অর্থে তা বড় বা জঘন্য হয়ে থাকে।

তাই সাময়িক ফিতনা বা নৈরাজ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন কোন কথাকে উপেক্ষা করা হয় এবং ছোট বিষয়ের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হয়। কিন্তু আপত্তিকারীরা কখনও বিবেক খাটায় নি, তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো আপত্তি করা। অনেকেই অন্যদের সম্পর্কে পক্ষে কথা বলে, যারা শাস্তি পায় তাদের পক্ষে দাঁড়িয়ে যায়, অথচ এরা জানে না যে, আসল বিষয় কি, আর কোন্ কারণে এই ব্যক্তির শাস্তি হয়েছে। তাই বিনা কারণে নাক গলানো উচিত নয় বা কারো সুপারিশ করা উচিত নয়। হ্যাঁ, ব্যবস্থাপনা যখন যুক্তিযুক্ত মনে করে তখন খবরাখবর নেয়া হয়, এরপর ক্ষমাও হয়ে যায়। এমন আপত্তিকারী আমি যেভাবে বলেছি আজও রয়েছে যারা কেউ অন্যায় কাজের পর শাস্তি পেলে তাদের সংশোধনের পরিবর্তে ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে অপলাপ করে থাকে, একই সাথে আবার এই দাবিও করে যে, আমরা যেমন আছি তেমনই থাকব, কিন্তু তা সত্ত্বেও জামাতের ব্যবস্থাপনার উচিত আমাদেরকে ব্যবস্থাপনার অঙ্গীভূত করা এবং আমাদের ক্ষমা করে দেয়া, আমরা আত্মসংশোধন করব না।

এখানে আমি পুনরায় স্পষ্ট করতে চাই যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিঃসন্দেহে তুর্কীর দূত সাহেবের জন্য যা প্রয়োজন ছিল তা আনিয়ে দিয়েছেন, যা নিষিদ্ধ নয়, যেভাবে অন্যান্য হারাম জিনিষ সম্পর্কে লেখা আছে, কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বয়ং হুক্কা পান করা বা তামাক সেবনকে অপছন্দ করতেন এবং কোন কোন সময় এর প্রতি ঘৃণাও প্রকাশ করেছেন।

তবলীগের জন্য কি কি মাধ্যম ব্যবহার করা উচিত এবং কিভাবে করা উচিত এ সম্পর্কে একবার হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, এখন নাযারাত দাওয়াত ও তবলীগ প্যাম্পলেট বা হস্তবিল ইত্যাদির মাধ্যমে তবলীগ করে, প্যাম্পলেট বা লিফলেট ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। কিন্তু প্যাম্পলেট এমন বিষয় যার বোঝা বেশিদিন সহ্য করা যায় না বা সহ্য করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তবলীগ হতো। সেই সব বিজ্ঞাপন দুই-চার পৃষ্ঠা সম্বলিত হতো আর এর ফলে সারা দেশে হৈচৈ সৃষ্টি হয়ে যেত। এইগুলো অজস্রধারায় প্রচার করা হতো। সেই যুগের নিরিখে অজস্র হওয়ার অর্থ হলো এক/দুই হাজার, অনেক সময় দশ হাজার সংখ্যাও বিজ্ঞাপন ছাপা হতো বা প্রচার করা হতো। তিনি বলেন, আমাদের জামাত এখন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন বিজ্ঞাপনের প্রচার বা প্রপাগান্ডা হলো বিজ্ঞাপন ৫০ হাজার বা লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় ছাপা উচিত, এরপর দেখ যে, বিজ্ঞাপন কিভাবে নিজের দিকে মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট করে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এখন কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন সংবাদ বেশ কয়েক লক্ষ মানুষের কাছেও পৌঁছে যায়, আর এর প্রভাব পার্শ্ববর্তী দেশেও পড়ে। আমেরিকা থেকে একটি সংবাদ এসেছে যে, সুইডেনের কোন নিউজ এজেন্সি বা টেলিভিশন চ্যানেল সেখানে আমাদের প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করে যে, সুইডেনে এখন ইসলামের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হচ্ছে, বলুন এটি কি, আল্লাহ্ই জানে কেন এভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে, তাই আমরা আপনার ইন্টারভিউ নিতে চাই। তো এভাবেও মনোযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। আমার সফরের সময় লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছেছে। যাহোক বিজ্ঞাপন, খবর বা সম্প্রচার মাধ্যমের সুবাদে ব্যাপক পরিসরে সংবাদ পৌঁছে যা সাধারণ বই-পুস্তকের মাধ্যমে পৌঁছানো সম্ভব নয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, প্রথমে বছরে যদি বারো বার বিজ্ঞাপন প্রচার হয়ে থাকে, তাহলে এখন বছরে যদি তা তিনবার করে দেয়া

হয় আর পৃষ্ঠা সংখ্যা যদি ২/৩ও করা হয় কিন্তু তা যদি এক বা দুই লক্ষ সংখ্যায় প্রচার করা হয় তাহলে বুঝা যাবে যে, তা কিভাবে গতি সঞ্চার করে। এখন আমরা দেখছি যে, এটি গতি সঞ্চার করছে এবং লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় তা ছাপা হয়। অনেক সময় অনেকেই বলে যে, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলে কি লাভ? লাভ আছে, কেননা সেইসব পত্রিকার সার্কুলেশনের মাধ্যমে জামাত পরিচিত হয় অথচ বই-পুস্তক আপনারা দুই মাসে যতটা বিতরণ করেন অনেক সময় এক পত্রিকার মাধ্যমে একদিনেই তার চেয়ে বেশি মানুষের কাছে সেই সংবাদ পৌঁছে যায়।

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আজকাল পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জামাত পরিচিত হচ্ছে, আমি যেভাবে বলেছি, অনেক জায়গায় তা হচ্ছে। জামাতের প্রেস এবং মিডিয়া বিভাগ আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এ ক্ষেত্রে বড় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে আর পৃথিবীর সর্বত্র ব্যাপক পরিসরে এটি হচ্ছে। সুতরাং তবলীগ বিভাগের কাজ হলো এই যে পরিচিতি, এটিকে লুফে নেয়া, আর ইসলামের প্রকৃত বাণীকে এভাবে প্রচার করতে থাকা। এমনটি মনে করা উচিত নয় যে, একবার পত্রিকায় এসেছে, বাস্ যথেষ্ট, এটি যেন না হয়। এই মাধ্যমকে তবলীগের জন্য কাজে লাগানো তবলীগ বিভাগের কাজ। এই পরিচিতিকে তবলীগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত। আর এর জন্য নিত্য নতুন পন্থা সন্ধান করা উচিত। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একবার শিশুদের তরবীয়তের উদ্দেশ্যে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন, যাতে তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি কাহিনীর উল্লেখ করেন। তিনি লিখেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ১৮৯৮ সনের ৫ই সেপ্টেম্বর আসরের নামাযের পর আমার অনুরোধে আমাকে নিম্ন লিখিত কাহিনী শুনান যা থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'লার ওপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভর করা এবং সত্যিকার তাকওয়া মানুষের মাঝে এই যোগ্যতা সৃষ্টি করে যে, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তার দায়িত্বভার নিয়ে নেন, আর এমনভাবে তার চাহিদা পূরণ করেন যে, মানুষ ভাবতেও পারে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এক পুণ্যবান ব্যক্তি সফরে যাচ্ছিলেন এবং এক জঙ্গল অতিক্রম করছিলেন। যেখানে এক চোর বসবাস করত যে সেই পথে যাতায়াতকারী প্রত্যেক মুসাফিরকে লুটপাট করত। অভ্যাস অনুসারে সে এই বুযুর্গের সাথেও একই ব্যবহার আরম্ভ করে। সেই পুণ্যবান ব্যক্তি তাকে বলে যে, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (সূরা আয্-যারিয়াত ৫১:২৩) অর্থাৎ তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা আকাশ থেকে করা হয় আর তোমাদের এর প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে যদি তোমরা পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক। তিনি বলেন, তোমার রিয্ক আকাশ থেকে আসে। আল্লাহ্ তা'লার ওপর নির্ভর কর আর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং চুরি পরিত্যাগ কর। আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তোমার চাহিদা পূরণ করবেন। সেই চোরের হৃদয়ে এই কথার গভীর প্রভাব পড়ে, তাই সে সেই পুণ্যবান ব্যক্তিকে ছেড়ে দিয়ে তার কথার ওপর আমল করে। কাহিনীর পরের অংশ হলো, এর ফলে স্বর্ণ-রৌপ্যের প্লেটে করে উন্নত খাবার তার কাছে আসতে থাকে। কোথায় আগে সে চুরি করত, আর এখন চুরি পরিত্যাগ করে আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করার ফলে স্বর্ণ-রৌপ্যের প্লেটে উন্নত খাবার তার কাছে আসতে থাকে। কাহিনী অনুসারে খাবার খেয়ে সেই স্বর্ণ-রৌপ্যের প্লেট সে তার ঝুপড়ি বা কুড়েঘরের বাইরে ফেলে দিত। দৈবক্রমে সেই পুণ্যবান ব্যক্তি সেই পথে যাচ্ছিলেন আর সেই চোর, যে এখন বড় পুণ্যবান এবং মুত্তাকী হয়ে গেছে, সেই বুযুর্গের কাছে পুরো অবস্থা বর্ণনা করে এবং বলে যে, আমাকে কুরআনের অন্য কোন আয়াত শুনান। সেই বুযুর্গ বলেন যে, فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ (সূরা আয্-যারিয়াত ৫১:২৪) অর্থাৎ আকাশ এবং পৃথিবীর প্রভুর কসম, নিশ্চয় এটি সত্য। এই পবিত্র শব্দনিচয় শুনে তার ওপর এত

গভীর প্রভাব পড়ে যে, খোদার মাহাত্ম্য এবং প্রতাপের ধারণায় সে ছটফট করে উঠে এবং এই অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

তো আট/দশ বছর বয়স্ক এক বালককে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই কাহিনী শুনান। আর সেই বালক অর্থাৎ মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই প্রবন্ধে শিশুদেরই বলছেন যে, তাকওয়া অবলম্বন করলে কত অসাধারণ সম্পদ মানুষের হস্তগত হয়। আল্লাহ্ তা'লা, যিনি আকাশ এবং পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষের লালন-পালন করেন, তাঁর পবিত্র সত্তা সম্পর্কে কোন সন্দেহ আছে কি? তিনি পবিত্র এবং সত্য খোদা, তিনি আমাদের সবাইকে লালন-পালন করেন। সুতরাং সেই খোদাকে ভয় কর, তাঁর ওপরই নির্ভর কর এবং পুণ্যের পথ অবলম্বন কর। তো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে এই ছিল শিশুদের অবস্থা। তাদেরকে এমন কথা শিখানো হতো যা আজকাল বড়দের জন্যও বুঝা কঠিন। তাই আমাদের প্রত্যেকের সব সময় স্মরণ রাখা উচিত যে, তাকওয়ার পথে বিচরণের চেষ্টা করুন আর খোদার সত্ত্বায় যেন পূর্ণ বিশ্বাস থাকে আর এর ওপর মানুষ যেন প্রতিষ্ঠিত থাকে যে, তিনিই আমাদের লালন-পালন ও দেখাশুনা করেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনিই পবিত্র এবং সত্য খোদা, তাঁকেই আমাদের ভয় করা উচিত, তাঁর কাছেই সব সময় যাচনা করা উচিত বা চাওয়া উচিত, তাঁর সামনেই বিনত হওয়া উচিত, তাঁর ওপরই নির্ভর করা উচিত বা ভরসা করা উচিত। আর এই নেকী বা এই পুণ্যই এক মুসলমানের অর্জন করা উচিত, এর ওপরই আমল করা উচিত, এর ওপরই প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

তাই শিশুদের চেয়ে জ্যেষ্ঠদের বা বড়দের জন্য এ কথার গুরুত্ব অধিক বা এই পাঠ নেয়ার গুরুত্ব অনেক বেশি যখনকিনা আজকাল আমরা এই কথাগুলো ভুলতে বসেছি। অনেক সময় অনেকেই দূরে সরে যায়, আর আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা বা নির্ভর করার পরিবর্তে মানুষের ওপর বেশি ভরসা বা নির্ভর করে। তাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রকৃত তাওয়াক্কুল খোদার সত্তায় হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবার মাঝে সেই তাকওয়া সৃষ্টি করুন।

নামাযের পর আমি দুই ব্যক্তির গায়েবানা জানাযা পড়াব। প্রথমটি আলহাজ্জ ডাক্তার ইদ্রিস বাঙ্গুরা সাহেবের যিনি সিয়েরালিওনের নায়েব আমীর ছিলেন। ২০১৬ সনের ১৩রা মে স্বল্পকাল অসুস্থ্য থেকে তিনি ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি বু শহরে আহমদীয়া স্কুলে পড়ালেখার সময় আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। ১৯৬৩ সনে মজলিসে আমেলার সদস্য নির্বাচিত হন এবং মৃত্যু পর্যন্ত কোন না কোন পদে জামাতের সেবার সৌভাগ্য পেয়েছেন। দীর্ঘকাল সেখানে ডেপুটি আমীর-১ হিসেবে জামাতের সেবা করছিলেন। সফল মুবাল্লিগ ছিলেন, অনেকেই তার মাধ্যমে আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছে। ঘর মসজিদ থেকে দূরে থাকা সত্ত্বেও ফযর, মাগরিব এবং এশার নামায মসজিদে এসে পড়তেন। ছুটির দিন সকাল থেকে আসর পর্যন্ত সময় মসজিদে ব্যয় করতেন এবং কুরআন তিলাওয়াত, নফল ইত্যাদিতে সময় অতিবাহিত করতেন। রীতিমত নামাযে জুমুআ পড়তেন, এমটিএ-তে খলীফায়ে ওয়াক্তের খুতবা রীতিমত শুনতেন, প্রতিদিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কোন বই পাঠ্য তালিকায় রাখতেন। সাহায্যের যোগ্য প্রত্যেক ব্যক্তির সাহায্য করতেন। পেশাগত দিক থেকে তিনি ডাক্তার ছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও এক দিক থেকে জামাতের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে রেখেছিলেন। বু অঞ্চলের অঞ্চলিক মুবাল্লিগ আকিল আহমদ সাহেব লিখেছেন যে, কোন সময় জামাতের সদস্যরা সাহায্যের আবেদন নিয়ে আসলে যদি বাজেটে সংকুলান না হত তাহলে

এমন লোকদের যারা মুবাল্লিগের কাছে আবেদন নিয়ে আসত, মুবাল্লিগ সাহেব তাদেরকে ডাক্তার সাহেবের কাছে নিয়ে যেতেন। কখনও এমন হয়নি যে, কেউ তার কাছে সাহায্যের জন্য এসেছে আর তাকে সাহায্য করা হয়নি। মরহুম অত্যন্ত স্নেহশীল এবং দয়াদ্রচিত্ত মানুষ ছিলেন। ওয়াকেফে যিন্দেগীদের বড় মনোযোগসহকারে চিকিৎসা করতেন। নিজের কাছে যে ঔষধ থাকত তা দিতেন এবং তাদেরকে দোয়ার অনুরোধ করতেন। গরীবদের বিনা মূল্যে চিকিৎসা সেবা দিতেন, বরং তাদের আসা যাওয়ার ব্যায়ভারও নিজেই বহন করতেন। অনেক রোগীর হাড়ের অপারেশন তিনি বিনামূল্যে করেছেন। স্বাস্থ্য যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন কোন রোগী আসলে তাকে হাসপাতালে পাঠাতেন এবং স্বয়ং তার ফিস আদায় করতেন। তার মাধ্যমে একজন নিষ্ঠাবান আহমদী ডাক্তার আলহাজ্জ শেখু তামু সাহেব বয়আত করেন এবং জামাতকে একটি ভূমিখণ্ড তোহফা স্বরূপ দেন। ডাক্তার বাঙ্গুরা সাহেব যখন এই সংবাদ জানতে পারেন যে, ইনি পরে এসে কুরবানীতে এগিয়ে গেছেন তখন শহরের প্রাণ কেন্দ্রে মসজিদের জন্য একটি জায়গা জামাতকে দেন, অনুরূপভাবে মসজিদ নির্মাণের জন্য ৩৫ মিলিয়ন লিওনও জামাতকে দান করেন। মরহুম জামাতের প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতেন, খলীফাদের জন্য গভীর আন্তরিকতার সাথে দোয়া করতেন, মুসী ছিলেন, অন্যান্য আর্থিক তাহরীকেও অংশ নিতেন। এরা এমন মানুষ যারা দূর দূরান্তের বিভিন্ন দেশে বসবাস করেন কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ঈমান আনার পর ক্রমাগতভাবে উন্নতি করেছেন। খোদা তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মে আহমদীয়াতকে প্রতিষ্ঠিত রাখুন এবং তারা যেন সব সময় জামাতের সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে।

দ্বিতীয় জানাযা হলো মনসুরা বেগম সাহেবার যিনি অষ্ট্রেলিয়া জামাতের নায়েব আমীর খালেদ সাইফুল্লাহ্ খান সাহেবের স্ত্রী। তিনি গত ২১শে জুলাই ২০১৬ তারিখে অষ্ট্রেলিয়ায় ইন্তেকাল করেন। إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি নামাযী, দোয়াগো এবং তাহাজ্জুদ গুজার ছিলেন। আহমদীয়াতের জন্য গভীর আত্মাভিমানী ছিলেন। খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক রাখতেন। নেক এবং পুণ্যবতী মহিলা ছিলেন। হাসপাতালেও নামাযের ব্যাপারে চিন্তিত থাকতেন। অসুস্থতার কারণে নামাযের কথা ভুলে গেলে স্বামীকে বলতেন যে, আপনি আমার সাথে নামায পড়ার ব্যবস্থা করুন। তিনি অষ্ট্রেলিয়া এবং লিবিয়ায় সদর লাজনা ইমাইল্লাহ্, অনুরূপভাবে পাকিস্তানের তারবেলা এবং লাহোরের সিভিল লাইন হালকায় খিদমত করার তৌফিক পেয়েছেন। টীম বানিয়ে কাজ করতেন, কুরআনের প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল, রীতিমত তিলাওয়াত করতেন। নিজের সন্তান-সন্ততি ছাড়া অন্যদের সন্তান-সন্ততিদেরও কুরআন পড়ানোর তৌফিক পেয়েছেন। ওসীয়্যত করেছেন, গভীর সচেতনতার সাথে চাঁদা দিতেন, হিস্যায়ে জায়েদাদ এবং হিস্যায়ে আমদ, ২০১৬ পর্যন্ত আদায় করেন। শোক সন্তপ্ত পরিবারে স্বামী ছাড়া দুই ছেলে এবং তিন মেয়ে স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ রেখে গেছেন যারা বিভিন্নভাবে ধর্মের সেবায় নিয়োজিত আছেন। তার এক পুত্র ওমর খালেদ সাহেব এখানে বসবাস করেন, লন্ডনের একটি হালকায় তিনি জামাতের প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করছেন। তার আরেক পুত্র অষ্ট্রেলিয়ায় ওয়াকফে জাদীদের ন্যাশনাল সেক্রেটারী। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, মাগফিরাত এবং করুনা করুন, তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মে সব সময় নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা বজায় রাখুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।